মুসলিম নারীর বিধান

كتاب المرأة المسلمة – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

كتاب المرأة المسلمة

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الخامسة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)
كتاب المرأة المسلمة – باللغة البنغالية / الزلفي ١٤٢٤
٢٨ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٦-٣١-٨٦٤-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١-المرأة في الإسلام ٢-الفتاوى الشرعية
أ. العنوان

ديوي ١،٢١٩ ١٤٢٤/٥١٤٥

رقم الإيداع : ١٤٢٤/٥١٤٥
ردمك : ٦-٣١-٨٦٤-٩٩٦٠

أحكام المرأة المسلمة

মুসলিম নারীর বিধান

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলামে নারীদের অধিকার সম্পর্কে তুলে ধরার পূর্বে অন্যান্য জাতির নিকট তাদের মর্যাদা এবং তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হতো, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা অতি আবশ্যক মনে করছি।

ইউনানদের নিকট মেয়েরা ছিল বেচা-কেনার সামগ্রী। তাদের কোনো প্রকার অধিকার ছিল না। সমস্ত অধিকার পুরুষদের জন্যই বরাদ্দ ছিল। মিরাস থেকে তারা ছিল বঞ্চিতা। ধন-সম্পদে তাদেরকে কোনো হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হত না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সুক্বরাত্বের বক্তব্য হলো, 'পৃথিবীর অধঃপতনের বড় ও প্রধান কারণই হলো নারীদের অস্তিত্ব। নারীরা হলো এমন একটি বিষাক্ত বৃক্ষের মত, যার বাহ্যিক অতি সুন্দর কিন্তু চড়ুই পাখি যখনই সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে।''

রোমকরা নারীদেরকে একটি আত্মাহীন বস্তু বলে গণ্য করত। নারীদের কোনো অধিকার এবং কোনো মূল্য তাদের নিকট ছিল না। তাদের কথা হলো, নারীদের রুহ বা আত্মা নেই। তাই তাদেরকে খুঁটির সাথে বেঁধে শরীরে গরম ও ফুটন্ত তেল ঢেলে মর্মান্তিক শাস্তি দেওয়া হত। কখনো কখনো এই নিষ্পাপ নারীদেরকে দ্রুতগামী ঘোড়ার লেজের

সাথে বেঁধে দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে তাদের প্রাণ নাশ করা হত।

হিন্দু ধর্মে নারীদের অবস্থা আরো জঘন্য ও নিকৃষ্ট ছিল। তারা নারীকে তার স্বামীর মৃত্যুর সাথে তারই চিতায় পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতো। (যাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়)

চীনারা বলে, নারীরা এমন যাতনাদায়ক পানি সদৃশ, যা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিকে ধুয়ে-মুছে বিনাশ করে দেয়। প্রত্যেক চীনার তার স্ত্রীকে বিক্রয় করার এবং জীবদ্দশায় তাকে সমাধিস্থ করার অধিকার ছিল।

ইয়াহুদীরা নারীদের মনে করে এক অভিশপ্ত প্রাণী। কারণ, এই নারীই আদমকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তাঁকে (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে বাধ্য করেছে। অনুরূপ তারা নারীকে অপবিত্রা মনে করে। তাই যখন তার মাসিক হয়, তখন সমস্ত ঘর ও তার [2]পর্শকৃত সমস্ত বস্তু অপবিত্র হয়ে যায়। অনুরূপ ভায়ের উপস্থিতিতে পিতার সম্পদ থেকে সে মিরাসও পেত না।

খ্রীষ্টানদের নিকট নারী হলো, শয়তান। খ্রীষ্টান ধর্মের একজন পুরোহিতের কথা হলো, মানব জাতির সাথে নারীর কোনো সম্পর্ক নেই। সাধু বুনাফান্তুর বলে, 'যখন কোনো নারীকে দেখবে, তখন এটা মনে করবে না যে, তোমরা কোনো মানব মূর্তি দেখেছ, এমনকি কোনো চতুষ্পদ পশুও না, বরং যা দেখেছ, তা নিছক শয়তান। আর তা হতে যা শুন, তা হল, আজদাহার বাঁশি।' ব্রিটিশ আইনানুসারে বিগত শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত নারীরা দেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হত না।

অনুরূপ ব্যক্তিগত কোনো অধিকার তাদের ছিলো না। সব রকমের মালিকানা থেকে তারা হত বঞ্চিতা। এমনকি পরিহিত পোশাকটারও তারা মালিক হত না। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যান্ড পার্লামেন্টে এ আইন প্রণয়ন হয় যে, নারীদেরকে কোনো কিছুর উপর আধিপত্য দেওয়া বৈধ নয়। অনুরূপ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সপ্তম হেনরীর যুগে নারীদের জন্য ইঞ্জীল পাঠ নিষিদ্ধ করে দেয়। কারণ, তারা অপবিত্রা। নারীরা মানুষ কিনা এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষণের জন্য ৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে এটাই স্বীকৃতি পায় যে, নারীরা মানুষ, তবে তাদেরকে পুরুষের সেবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্রিটিশ আইনানুযায়ী ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে বিক্রয় করা বৈধ ছিল। ছয় পেনী (ব্রিটিশ মুদ্রা) পর্যন্ত তার মূল্য নির্দিষ্ট ছিল। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবে নারীরা খুবই তুচ্ছ, ত্যাজ্য ও হেয় প্রতিপন্না ছিল। না তারা মিরাস পেত, না কোনো অধিকার। এমনকি তাদেরকে কোনো কিছু গণ্যই করা হত না। আবার অনেকে তাদের মেয়েদেরকে জীবন্ত সমাধিস্থ করত। অতঃপর নারীদেরকে নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে এবং নারী-পুরুষ সকলে সমান, পুরুষের ন্যায় তাদেরও অধিকার আছে-এর উদাত্ত ঘোষণা দিতে আবির্ভাব হয় ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات١٣]

“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানী, যে অধিক আল্লাহভীরু।” (হুজরাত ১৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَمَن يَّعْمَلْ مِنَ الصاَّلِحاَتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَى وَهُوَ مُـؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَـدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْراً ﴾ [النساء١٢٤]

“আর যে নেক কাজ করবে-সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক-সে যদি ঈমানদার হয়, তবে এই ধরনের লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি (খেজুরের আঁটির পিঠে) বিন্দু পরিমাণ যুলুম করা হবে না।” (নিসা ১২৪) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَوَصَّيْناَ اْلإِنْساَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ [العنكبوت٨]

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।” (আনকাবুত ৮) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَكْمَلُ المؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا)) [رواه الترمذي ١١٦٢]

পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী তো সে-ই, যার চরিত্র সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।”

(তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ)। এক ব্যক্তি নবী করীম-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা ক'রে বললো,

((يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قال أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوْكَ)) [متفق عليه ٢٥٤٨،٥٩٧١]

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি হরদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললো, তার পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললো, তার পর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললো, তার পর কে? তিনি বললেন, তোমার বাপ।" (বুখারী৫৯৭১-মুসলিম২৫৪৮)

এই হল নারীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামের দৃষ্টিকোণ, যা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

নারীর সাধারণ কিছু অধিকার

নারীর সাধারণ কিছু এমন অধিকার রয়েছে, যা তার নিজেরও জানা উচিত এবং তার জন্য অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দেওয়াও উচিত। তাহলে সে যখনই চাইবে তখনই এ অধিকারগুলো দ্বারা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে। আর তার অধিকারগুলোর সার-সংক্ষিপ্ত হলো,

১। মালিক হওয়ার অধিকারঃ নারী ঘর-বাড়ী, জমি-জায়গা, কল-কার-খানা, উদ্যান, সোনা-রূপা ও বিভিন্ন প্রকারের গবাদি পশু সহ সব

কিছুর মালিক হতে পারবে। চায় সে-স্ত্রী হোক, মা হোক অথবা কন্যা বা বোন হোক।

২। বিবাহ করার অধিকারঃ স্বামী নির্বাচন, খুলআ' কামনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার তার রয়েছে। আর নারীর এ অধিকার-গুলো প্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত।

৩। তার উপর ওয়াজিব এমন বিষয়ের জ্ঞানার্জনঃ যেমন, মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, ইবাদতসমূহ ও তা সম্পাদন করার তরীকা-পদ্ধতি সম্পর্কে জানা, তার উপর ওয়াজিব কর্তব্য ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে জানা, অত্যাবশ্যক শিষ্টাচারসমূহ এবং উৎকৃষ্ট নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করা। কারণ, এ ব্যাপারে আল্লাহর সাধারণ নির্দেশ রয়েছে। তিনি বলেন,

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ [محمد ٢٩]

"জেনে রাখো! আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নেই।" (মুহাম্মাদ ২৯) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বাণীও রয়েছে, তিনি বলেছেন,

((طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) [ابن ماجة ٢٢٠]

"প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।" (ইবনে মাজা ২২০)

৪। নিজ সম্পদ থেকে সে (স্ত্রী) স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী সাদক্বা করতে পরবে এবং নিজের উপর, স্বামী, সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতার উপর ব্যয়

করতেও পারবে। তবে তা যেন অপচয় ও অপব্যয়ের পর্যায়ে না পৌঁছে। এ ব্যাপারে তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধিকারের মত।

৫। ধন-সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অসীয়ত করার অধিকারঃ সে তার জীবদ্দশায় স্বীয় মালের এক তৃতীয়াংশের অসীয়ত করতে পারবে এবং কোনো অভিযোগ আপত্তি ছাড়া তার মৃত্যুর পর তা (অসীয়ত) কার্যকর হবে। কেননা, অসীয়ত সাধারণতঃ ব্যক্তিগত অধিকার। এ অধিকার যেমনি পুরুষের রয়েছে, তেমনি নারীরও আছে। কারণ আল্লাহর সাওয়াব ও প্রতিদান থেকে কেউ অমুখাপেক্ষী নয়। তবে শর্ত হলো, অসীয়ত যেন সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশী না হয়। আর এতেও পুরুষ ও নারীর অধিকার সমান।

৬। পোশাক পরিধানের অধিকারঃ সে (স্ত্রী) রেশম ও সোনা যা চায় পরিধান করতে পারবে। আর এদু'টি পুরুষদের জন্য হারাম। তার অধিকার ও স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, পোশাক শূন্য অবস্থায় প্রদর্শন ক'রে বেড়াবে অথবা অর্ধাংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ কাপড় পরবে কিংবা মাথা, গলা ও বক্ষদেশ উন্মুক্ত রাখবে। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো ব্যক্তি হয় যার সামনে এগুলো করা যেতে পারে তার কথা ভিন্ন।

৭। রূপচর্চার অধিকারঃ অর্থাৎ, সে তার স্বামীর জন্য সে রূপচর্চা করতে পারবে। সুতরাং সে চোখে সুরমা লাগাতে পারবে। ইচ্ছা হলে গালে ও ঠোঁটে লাল লিপষ্টিক ব্যবহার করতে পারবে। সর্বোৎকৃষ্ট মনোহারী ও সুন্দর পোশাক এবং হার ও গহনা পরতে পারবে। তবে

বাতিল ও সন্দেহ-সংশয়ের স্থান থেকে দূরে থাকার সংকল্পে পোশাক পরিচ্ছদে অমুসলিম নারীদের অথবা বেশ্যা, পতিতা ও দেহ ব্যবসায়ী লম্পট নারীদের ফ্যাশন অবলম্বন করবে না।

৮। পানাহারের অধিকারঃ সে স্বীয় স্বাদ অনুপাতে যা ভাল লাগে ও পছন্দ হয়, তা-ই সে পানাহার করতে পারবে। পানাহারের ব্যাপারে নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। যা হালাল, তা উভয়ের জন্য হালাল এবং যা হারাম, তা উভয়ের জন্য হারাম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَتُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾ [الأعراف٣١]

"পানাহার করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারী-দেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আ'রাফ ৩১) এ সম্বোধনে নারী-পুরুষ উভয়েই শামিল।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারঃ

স্বামীর উপর স্ত্রীর কিছু বিশেষ অধিকার রয়েছে। আর স্ত্রীর এ অধিকা-রগুলো স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়। কারণ, স্ত্রীও স্বামীর কিছু বিশেষ অধিকার আদায় করে। যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা না হলে, স্বামীর আনুগত্য করে, তার খানা-পানি তৈরী করে, বিছানা পরিপাটি রাখে, তার সন্তানদের দুধ পান করায়, তাদের লালন-পালন করে, তার অর্থ ও মান মর্যাদা রক্ষা করে, নিজের সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা করে এবং বৈধতার আওতায় স্বামীর জন্য রূপচর্চা করে ও

নিজেকে সৌন্দর্যময় রাখে। নিম্নোক্ত জিনিসগুলো স্বামীর উপর স্ত্রীর অত্যাবশ্যকীয় অধিকার, যা আল্লাহর বাণী প্রমাণ করে,

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ [البقرة ٢٨٨]

"নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।" (সূরা বাক্বারা ২২৮) আমরা সে অধিকারগুলো তুলে ধরছি, যাতে মু'মিন নারী তা জেনে নেয় এবং কোনো প্রকার লজ্জা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয় ভীতি ছাড়াই তা দাবী করতে পারে। আর স্বামীর দায়িত্ব হলো, সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদায় করা। হ্যাঁ, স্ত্রী তার অধিকারের কোনো কিছু স্বামীকে ক্ষমা করতে চাইলে, তা সে করতে পারে।

১। স্বামী স্বীয় আর্থিক সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা অনুসারে স্ত্রীর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে। স্ত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার, চিকিৎসা ও বাসস্থান এই ব্যয়ভারের আওতায় পড়বে।

২। স্বামী স্ত্রীর মান-সম্ভ্রম, দেহ, অর্থ-সম্পদ ও তার দ্বীনের সংরক্ষণ করবে। কেননা, স্বামীই হল স্ত্রীর অভিভাবক। আর অভিভাবকত্বার দাবী হল, দায়িত্বপ্রাপ্ত জিনিসের সংরক্ষণ ও হেফাযত করা।

৩। তাকে দ্বীনের জরুরী বিষয়াদির শিক্ষা দেওয়া। তবে স্বামী তাতে অক্ষম হলে, অন্ততপক্ষে তাকে মহিলাদের জন্য আয়োজিত ইলমের সমাবেশগুলোতে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া। তা মসজিদ, মাদ্রাসায় হোক বা অন্য কোথাও। তবে শর্ত এই যে, সেখানে ফেতনা

এবং স্বামী-স্ত্রী কারো যেন কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে এর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকতে হবে।

৪। স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করা। কারণ, মহান আল্লাহ পলেন,

﴿ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ [النساء١٩]

"তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো।" (সূরা নিসা ১৯) স্ত্রীর যৌন কামনা পূরণের অধিকার হরণ না করা, গালি-গালাজ, মন্দ আচরণ এবং অপমানজনক ব্যবহার দ্বারা তাকে কষ্ট না দেওয়া, তার উপর কোনো ফিতনার ভয় না থাকলে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা না দেওয়া, তার শক্তি ও সামর্থ্যরে ঊর্ধ্বে কাজের চাপ না দেওয়া এবং কথা ও আচরণে সুন্দর ব্যবহার করা ইত্যাদি সবই সদ্ভাবে জীবন-যাপন করার আওতায় পড়ে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ)) [رواه الترمذي ٣٨٣٠]

"তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে-ই, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চেয়ে উত্তম।" (তিরমিজী ৩৮৩০)

পর্দাঃ

পরিবারকে ধ্বংস ও অবনতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ইসলাম বড়ই যত্ন নিয়েছে এবং তাকে চরিত্র ও শিষ্টাচারের শক্ত জালের মাধ্যমে সুরক্ষিত করেছে। যাতে পরিবার সুষ্ঠু হয় এবং সমাজ এমন পরিষ্কার ও পরিছন্ন হয়, যেখানে প্রবৃত্তির উপদ্রব থাকবে না এবং থাকবে না

স্বেচ্ছাচারিতার দৌরাত্ম্য। ফিতনা সৃষ্টিকারী সকল উত্তেজনামূলক পথকে রোধ করতে নারী-পুরুষকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা পর্দার বিধান দিয়েছন নারীর সম্মানার্থে, তার মান সম্ভ্রমকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার হাত থেকে রক্ষার্থে, কুপ্রবৃত্তি ও অসৎলোকের কুদৃষ্টি থেকে তাকে দূরে রাখতে, আর যাদের নিকট মান-মর্যাদার কোনো মূল্য নেই, তাদের কবল থেকে তাকে হেফাজত করতে, বিষাক্ত দৃষ্টি থেকে জন্মায় এমন ফিতনার দরজা বন্ধ করতে এবং তার সম্ভ্রম ও নৈতিক পবিত্রতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার জালে সুরক্ষিত রাখতে পর্দার বিধান দান করেছেন।

আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন যে, পর্দা করা মহিলার উপর ওয়াজিব সুতরাং তার উপর ওয়াজিব হল, অপরিচিত পর পুরুষের সামনে সৌন্দর্যের এবং তার আকর্ষণীয় স্থানের প্রকাশ না করা। তবে হাত ও মুখমন্ডলকে আবৃত রাখার ব্যাপারে আলেমরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। আর পর্দা করা যে ওয়াজিব এবং কোন্ কোন্ স্থান আবৃক করতে হবে, এ ব্যাপারে দলীলাদির সংখ্যা অনেক। প্রত্যেক দল পর্দা সম্পর্কে বর্ণিত প্রমাণাদির কিছু অংশকে স্বীয় মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তার পরিপন্থী দলীলসমূহকে বিভিন্ন উক্তির দ্বারা খন্ডন করেছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوْهُنَّ مِن وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب٥٣]

“তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।” (সূরা আহযাব ৫৩) তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِساَءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ، ذِلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكاَنَ اللهُ غَفُوْراً رَّحِيْماً﴾ [الأحزاب٥٩]

“হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু’মিনদের রমণী-গণকে বলো, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (চেহারার) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আহযাব ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصاَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَ ماَ ظَهَرَ مِنْهاَ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ... ﴾ [النور٣]

“মু’মিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে, তারা তাদের বক্ষঃস্থল যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী ব্যতীত

কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না কর।” (সূরা নূর ৩) হাদীসে নাবী কারীম-ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ)) [متفق عليه ٥٧٨، ٦٤٥]

“মু’মিনা নারীরা নাবী কারীম-ﷺ-এর সাথে ফজরের নামাযে যোগদান করতেন। অতঃপর নামায শেষে চাদরে নিজেদেরকে আবৃত ক’রে আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করাকালীন অন্ধকারের জন্য তাঁদেরকে কেউ চিনতে পারতো না।” (বুখারী ৫৭৮-মুসলিম ৬৪৫) আয়েশা থেকেই আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন

((كَانَ الرَّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٍ، فَإِذَا حَاذُوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحدَاهُنَّ جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ)) [أخرجه أبوداود ١٨٣٣ وأحمد ٢٢٨٩٤]

“আমরা। নাবী কারীম-ﷺ-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকতাম। বাহনের আরোহীরা যখন আমাদের নিকট হয়ে অতিক্রম করতো, তখন আমাদের কেউ তার চাদর মাথা থেকে মুখমন্ডল পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিতো। অতঃপর যখন তারা চলে যেতো, তখন আমরা মুখমন্ডল খুলে নিতাম।”

(আবূ দাউদ ১৫৬২, আহমদ ২২৮৯৪) আয়েশা থেকেই বর্ণিত আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

((يَـرْحَمُ اللهُ نِسـاَءَ الْمُهـاَجِراتِ الْأُوَلَ لَمـاَّ أَنْـزَلَ اللهُ تعـالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ..﴾ شَقَقْنَ مُرُوْطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهاَ)) [رواه البخاري]

"সর্ব প্রথম হিজরতকারিণী মহিলাদের উপর আল্লাহ রহম করুন! যখন আল্লাহর এই বাণী, "এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে" অবতীর্ণ হয়, তখন তাঁরা নিজেদের চাদরকে দু'ভাগ ক'রে একাংশকে ওড়না বানিয়ে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।" (বুখারী)

পর্দার ব্যাপারে বর্ণিত দলীলের সংখ্যা অনেক। এ ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ না করেও বলা যায় যে, প্রয়োজন বোধে নারী তার মুখমন্ডল খুলতে পারবে, এ ব্যাপারে সকলে একমত। যেমন ডাক্তারের সামনে চিকিৎসার জন্য খোলা। অনুরূপ এ ব্যাপারেও সকলে একমত যে, ফিতনার আশঙ্কা থাকলে মুখমন্ডল খুলে রাখা বৈধ হবে না। এমন কি যাঁরা মুখমন্ডল খুলে রাখা বৈধ বলে মনে করেন, তাঁরাও ফিতনার আশঙ্কাকালীন তা আবৃত রাখা ওয়াজিব বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর বর্তমানে যখন ফিতনা-ফ্যাসাদ ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে, অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ এত আধিক্য লাভ করেছে যে, শহর-বাজার ও সর্বত্র তা ছেয়ে গেছে এবং সৎ ও আল্লাহভীরু লোকের হার কমে

গেছে, এর থেকে বড় ফিতনা আর কি হতে পারে? অনুরূপ যে নারীরা তাদের মুখমন্ডল খুলে রাখে, তারা (সেজেগুজে) নিজেদের চেহারা ও চক্ষুকে শোভান্বিত করে যেটা সকলের ঐক্যমতে হারাম।

চরিত্র, পরিবার ও মান-সম্মানকে সুরক্ষিত রাখার জন্যই ইসলাম নারীর উপর হারাম করে দিয়েছে পরপুরুষের সাথে অবাধ মেলা-মেশাকে। ইসলাম মানুষের হেফাযত ও ফেতনা সৃষ্টিকারী সমস্ত পথকে বন্ধ করতে খুবই তৎপর। আর নারীর পর্দাহীনতার সাথে চলা-ফেরায়, অপরিচিত লোকদের সাথে বাধাহীনভাবে মেলা-মেশায় প্রবৃত্তির তাড়ণা জেগে উঠে, অন্যায়ের পথ সুগম হয়ে যায় এবং অন্যায় অনৌচিত্য কর্ম-কান্ড অনায়াসে সংঘটিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ﴾ [الأحزاب٣٣]

“তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন ক’রে বেড়িয়ো না।” (সূরা আহযাব ৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب٣٣]

“তোমরা তার পত্নীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।” (সূরা আহযাব ৫৩)

নাবী কারীমﷺ নারী-পুরুষের অবৈধ মেলা-মেশাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি এ পথে উদ্বুদ্ধকারী সকল উপকরণকেও বন্ধ করে দিয়েছেন, যদিও তা ইবাদতের ক্ষেত্রে ও ইবাদতের স্থানেও হয়।

কখনো কখনো নারী নিজ বাড়ি থেকে ঐ স্থানে যেতে বাধ্য হয়, যেখানে পুরুষের সমাগম। যেমন, তার নিজ প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য বের হওয়া, যখন তার নিকট এমন কেউ থাকে না, যে তার প্রয়োজন পূরণ করে দিতে পারে অথবা তার নিজের জন্য বা তার অধীনস্থদের জন্য জীবিকার কেনাবেচা সহ অন্যান্য প্রয়োজনাদির জন্য বের হওয়া। এ সব ক্ষেত্রে তার বাড়ি থেকে বের হওয়াতে কোনো দোষ নেই। তবে শরীয়তের বিধিকে খেয়ালে রাখতে হবে। যেমন, ইসলামী বেশভূষায়, সর্বাঙ্গ ঢেকে, সৌন্দর্যের প্রকাশ না ক'রে বের হওয়া এবং পুরুষদের থেকে সব সময় পৃথক থাকা, তাদের সাথে মিশে না যাওয়া।

পরিবার ও নৈতিকতার রক্ষার জন্য ইসলাম আরো যে সমস্ত বিধান প্রণয়ন করেছে, তন্মধ্যে হলো, বেগানা কোনো ব্যক্তির সাথে নারীর নির্জনে অবস্থান করাকে হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া হলো অন্যতম বিধান। নবী করীম-ﷺ-ও বেগানা কোনো ব্যক্তির সাথে নারীকে নির্জনে অবস্থান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, যদি তার সাথে তার স্বামী বা মাহরাম (যাদের সাথে তার বিয়ে হারাম) না থাকে। কেননা, মানুষের আত্মা ও চরিত্রকে কলঙ্কিত করার কাজে শয়তান সব সময় তৎপর।

মাসিক ও নাফাসেন বিধানঃ

মাসিকের সময় সীমা

১। বেশীরভিগ ক্ষেত্রে যে বয়সে মাসিক আসতে দেখা যায় তা হলো, ১২ থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত। তবে নারীর মাসিক এর আগে অথবা পরেও আসতে পারে তা নির্ভর করে তার অবস্থা ও আবহাওয়ার উপরে।

২। মাসিকের সময়সীমা কম-সে-কম এক দিন এবং সর্বাধিক ১৫দিন।

গর্ভবতীর মাসিকঃ বেশীরভাগ এটাই দেখা যায় যে, নারীরা যখন গর্ভবতী হয়, তখন তাদের ঋতু (মাসিক) বন্ধ হয়ে যায়। তবে যদি গর্ভবতী রক্ত দেখে, আর তা যদি প্রসবের দু'দিন অথবা তিন দিন আগে হয়, আর তার সাথে প্রসব বেদনাও যদি অনুভব করে, তাহলে সেটা নিফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি প্রসবের অনেক দিন অথবা অল্প দিন আগে হয়, আর তার সাথে যদি কোনো ব্যাথা-বেদনা না থাকে, তাহলে সেটা না নিফাসের রক্ত হবে, আর না হায়েযের। তবে যদি অনবরত হায়েযের রক্ত আসতে থাকে গর্ভবতী হওয়ার পরও যদি তা বন্ধ না হয়, তাহলে সেটা মাসিক বলেই গণ্য হবে।

মাসিকের ব্যতিক্রমঃ মাসিকের ব্যতিক্রম কয়েক প্রকারের হয়। যেমন, প্রথমতঃ কম-বেশী হওয়া। অর্থাৎ, নারীর নির্ধারিত অভ্যাস হলো ছয় দিন, কিন্তু মাসিক সাত দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকছে, অথবা তার নিয়ম সাত দিন অথচ সে ছয় দিনেই পবিত্র হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ আগে-পিছে হওয়া। অর্থাৎ, নারীর নিয়ম হলো, তার মাসের শেষে হায়েয আসে, কিন্তু মাসের শুরুতেই হায়েয আসতে দেখলো অথবা নিয়ম হলো, তার মাসের প্রথম দিকেই হায়েয আসে, কিন্তু হায়েয মাসের শেষে আরম্ভ হলো। সে যখনই এমন রক্ত দেখবে, যে রক্তের সাথে সে পরিচিত (যে তা হায়েযের) তখনই সে হায়েযগ্রস্ত বলে পরিগণিতা হবে। আর যখনই তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে, তখনই পবিত্রা বলে গণ্য হবে, তাতে তার নিয়মের বেশী হোক কিংবা কম হোক, আগে হোক কিংবা পরে হোক।

তৃতীয়তঃ রক্তের রঙ হলুদবর্ণ বা ঘোলাটে হওয়া। অর্থাৎ, রক্তের রঙ দেখলো আহত স্থান থেকে নির্গত পানির ন্যায় হলুদবর্ণ অথবা হলদে ও কালো মিশ্রিত ঘোলাটে। এটা যদি হায়েয চলাকালীন দিনে অথবা হায়েযের পরে পরেই পবিত্র হওয়ার পূর্বেই দেখে, তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে এবং এর উপর হায়েযের বিধান আরোপিত হবে। কিন্তু যদি পবিত্রতা অর্জনের পর দেখে, তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না।

চতুর্থতঃ কেটে কেটে রক্ত আসা। যেমন, একদিন রক্ত দেখে, আর একদিন পরিষ্কার (রক্ত দেখে না) ইত্যাদি। এর দু'টি অবস্থা যথা,

প্রথম অবস্থাঃ যদি এটা মহিলার সাথে সব সময় ঘটে থাকে, তাহলে ইস্তিহাযার রক্ত বলে পরিগণিত হবে এবং এমন যার হবে, তার উপর ইস্তিহাযার বিধান আরোপিত হবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ এটা সব সময় মহিলার সাথে ঘটে না বরং কখনো কখনো হয় এবং এর পর সে পবিত্রতার একটি সঠিক সময় পায়। তবে রক্ত যদি একদিনের কমে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পবিত্র বলে গণ্য হবে না। সুতরাং একদিনের কমে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে পবিত্র বলে গণ্য হবে না। তবে সে যদি এমন কোনো জিনিস দেখে যা পবিত্রতাকে প্রমাণ করে, তাহলে তার কথা ভিন্ন কথা। যেমন, সে যদি তার নিয়মের ঠিক শেষের দিকে রক্ত বন্ধ হয় অথবা সে যদি 'কাসসাতুল বায়যা' দেখে। আর 'কাসসাতুল বায়যা' হল, সাদা স্রাব যা হায়েয বন্ধ হওয়ার পর রেহেম থেকে নির্গত হয়।

পঞ্চমতঃ শুকনো ধরনের রক্ত আসা। অর্থাৎ, ঠিক রক্ত নয়, কেবল সিক্ত দেখে। এটা যদি হায়েয আসার দিনে অথবা হায়েয বন্ধ হওয়ার পরে পরেই পবিত্র হওয়ার পূর্বেই দেখে, তাহলে হায়েয বলে গণ্য হবে। আর যদি পবিত্র হওয়ার পর দেখে, তাহলে তা হায়েয হবে না।

মাসিকের বিধানঃ

প্রথমতঃ নামায, হায়েযজনিতা মহিলার উপর ফরয ও নফল প্রত্যেক নামাযই হারাম। তার কোনো নামায পড়াই ঠিক হবে না। অনুরূপ নামাযগুলো পরে আদায় (কাযা) করাও তার উপর ওয়াজিব হবে না। তবে যদি হায়েয আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অথবা শেষ হওয়ার পর এতটা সময় পায়, যাতে পূর্ণ এক রাকআত নামায আদায় করা সম্ভব, তাহলে সেটা তার উপর ওয়াজিব হবে। যেমন, একটি মহিলার সূর্যাস্তের

এতটা সময় পর হায়েয আরম্ভ হলো যে, এক রাকআত নামায পড়া যেতো, এ অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করার পর তাকে মাগরিবের নামায কাযা করতে হবে। কারণ, সে হায়েযগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে এক রাকআত নামায পড়ার মত সময় পেয়ে ছিল। আর এর শেষ সময়ের দৃষ্টান্ত হলো, একটি মহিলা সূর্যোদয়ের এতটা সময় পূর্বে হায়েয থেকে পবিত্রা হলো যে, এক রাকআত নামায পড়া যেতো, এমতাবস্থায় পবিত্রতা অর্জনের পর ফজরের নামায তাকে কাযা করতে হবে। কারণ, (পবিত্র হওয়ার পর) এতটা সময় সে পেয়ে ছিল, যা এক রাকআত নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

(তবে যিকর, ‘তাকবীর’ (আল্লাহু আকবার) বলা, ‘তাসবীহ’ (সুবহা-নাল্লাহ) পাঠ করা, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পাঠ করা, খাবার ইত্যাদির সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলা, ফিক্বাহ’ ও হাদীস পাঠ করা, দুআ করা ও দুআর উপর’ আমীন বলা এবং কুরআন শোনা ইত্যাদি কোনো কিছুই হায়েয-জনিতা গ্রস্ত মহিলার উপর হারাম নয়। তার (মাসিকজনিতা মহিলার) জন্য কুরআন স্পর্শ না ক’রে মুখস্থ পড়া জায়েয। তবে যদি ক্বুরআনের মুরাজাআ’ অথবা ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি ঠিক করার জন্য ক্বুরআনের পড়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে হাতমোজা অথবা অন্য কোনো আবরণের মাধ্যমে তা (ক্বুরআন) স্পর্শ করতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ রোযা, ঋতুমতী নারীর উপর ফরয ও নফল সব রোযাই হারাম। কোনো রোযা রাখা তার জন্য জায়েজ নয়। তবে ফরয রোযার

কাযা (পরে আদায় করা) তার উপর ওয়াজিব। রোযা রাখা অবস্থায় যদি তার হায়েয আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে, যদিও তা সূর্যাস্তের সামান্য পূর্বে হয়। এদিনের রোযার কাযা করা তার উপর ওয়াজিব, যদি সেটা ফরয রোযা হয়। তবে সে যদি সূর্যাস্তের পূর্বে হায়েয অনুভব করে কিন্তু তা নির্গত হয় সূর্যাস্তের পর, তাহলে তার এ দিনের সঠিক বলে গণ্য হবে, বাতিল হবে না। যদি হায়েয অবস্থায় ফজর হয়ে যায়, তাহলে এ দিনের রোযা শুদ্ধ হবে না, যদিও সে ফজরের অল্প-একটু পরই পবিত্রত হয়ে যায়। আর যদি ফজরের অল্প-একটু পূর্বে পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তার রোযা সঠিক বলে গণ্য হবে, যদিও সে গোসল ফজরের পরে করে।

তৃতীয়তঃ কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা, ফরয ও নফল সব রকমের তাওয়াফই তার উপর হারাম। কোনো তাওয়াফ করা ঠিক হবে না। তাওয়াফ ব্যতীত অন্যান্য হজ্জ ও উমরার কাজ সুস্পন্ন করা তার উপর হারাম হবে না। যেমন, সাফা-মারওয়ার সাঈ করা, আরাফায় অবস্থান, মুজদালেফা ও মিনায় রাত্রিবাস এবং জামাড়াসমূহে কাঁকর মারা ইত্যাদি। সুতরাং কোনো মহিলা যদি পবিত্রাবস্থায় তাওয়াফ আরম্ভ করে, এবং তাওয়াফের পরে পরেই কিংবা সাঈ করার সময় হায়েযের রক্ত আসা শুরু হয়ে যায়, তাহলে এতে কোনো দোষ নেই।

চতুর্থতঃ মসজিদে অবস্থান করা, মাসিকজনিতা মহিলার মসজিদে অবস্থান করা হারাম।

পঞ্চমতঃ সঙ্গম করা, তার (স্ত্রীর) সাথে যৌনবাসনা চরিতার্থ করা তার স্বামীর উপর হারাম এবং স্বামীকে এ সুযোগ দেওয়া তার উপর হারাম। তবে আল্লারই প্রশংসা যে, সঙ্গম ব্যতীত চুমা ও লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গের সাংস্পর্শের মাধ্যমে যৌনক্ষুধা নিবারণের অনুমতি রয়েছে।

ষষ্ঠতঃ তালাক, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া স্বামীর উপর হরাম। যদি সে হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়, তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যকারী এবং হারাম কাজ সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে। আর এমতাবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করা ও পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখা তার উপর ওয়াজিব হবে। অতঃপর পবিত্র হয়ে গেলে ইচ্ছা করলে তাকে তালাক দিতে পারবে। তবে উত্তম হল, দ্বিতীয় হায়েয পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেওয়া। দ্বিতীয় হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে গেলে ইচ্ছা হলে রাখতেও পারে, আবার তালাক দিতেও পারে।

সপ্তমতঃ গোসল ওয়াজিব হওয়া। হায়েয সমাপ্তির পর সর্বাঙ্গ শরীরকে ধুয়ে পবিত্রতা অর্জন করা তার উপর ওয়াজিব। মাথার বেণী খুলা অপরিহার্য নয়, কিন্তু যদি এমন শক্ত করে বাঁধা থাকে, যাতে আশঙ্কা বোধ করে যে চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছবে না, তাহলে তা খুলতে হবে। যদি নামাযের সময়ের মধ্যে পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে তড়িঘড়ি গোসল করা অপরিহার্য হবে যাতে সময়ে নামাযটা আদায়

করতে সক্ষম হয়। যদি সে সফরে থাকে আর কাছে পানি না থাকে, অথবা পানি আছে কিন্তু তার ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা বোধ করে, অথবা সে রোগাক্রান্ত, পানির ব্যবহারে তার ক্ষতি হতে পারে, তাহলে সে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। অতঃপর আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে গেলে গোসল করে নিবে।

ইস্তিহাযাহ ও তার বিধানঃ

ইস্তিহাযা হলো, মাসিকের (নির্দিষ্ট সময় শেয় হয়ে যাওয়ার) পরও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকা, বন্ধ না হওয়া অথবা সাময়িকের জন্য বন্ধ হওয়া। যেমন মাসে মাত্র এক দু'দিনের জন্য বন্ধ হওয়া। কেউ কেউ বলে ১৫দিনের বেশী রক্ত আসাকে ইস্তিহাযা বলে যদি সেটা তার নিয়ম না হয়।

যে মহিলা ইস্তিহাযার শিকার হয়, তার তিনটি অবস্থা হয়ঃ

প্রথমঃ ইস্তিহাযার পূর্বে তার হায়েয আসার একটি নির্দিষ্ট সময় ছিলো, এমতাবস্থায় সে তার সাবেক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কাজ ক'রে সেই দিনগুলোই হায়েযের দিন হিসাবে ধরবে এবং তাতে হায়েযের বিধি অনুযায়ী আমল করবে, বাকী দিনগুলো ইস্তিহাযা বলে বিবেচিত হবে এবং এতে ইস্তিহাযার বিধান পালনীয় হবে।

এর উদাহরণ হলো, একটি মহিলার প্রত্যেক মাসের শুরুতেই ছয় দিন রক্ত আসতো। অতঃপর সে ইস্তিহাযায় জড়িত হয়ে পড়ে। রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকতে লাগলো, এমতাবস্থায় মাসের কেবল প্রথম

ছয়দিন তার হায়েয বলে গণ্য হবে, আর অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তিহাযা। তাই সে তার নির্দিষ্ট দিনগুলোই হায়েয গণ্য করবে। তার পর গোসল করবে ও নামায পড়বে। ছয় দিনের অতিরিক্ত যে রক্ত আসে, তার কোনো পরোয়া করবে না।

দ্বিতীয়ঃ ইস্তিহাযায় জড়িত হওয়ার পূর্বে তার মাসিকের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিলো না। অর্থাৎ, যখন থেকে সে রক্ত দেখেছে, তখন থেকেই তার এই অবস্থা। এই অবস্থায় সে রক্তের মধ্যে পার্থক্য অনুযায়ী আমল করবে। সুতরাং যে কটা দিন রক্তের রঙ কালো অথবা গাঢ় হবে অথবা এমন গন্ধ, যা প্রমাণ করে যে, তা মাসিকেরই রক্ত, তাহলে সে এই দিনগুলো মাসিক হিসাবে ধরবে। অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তিহাযা পরিগণিত হবে এবং তাতে ইস্তিহাযার বিধান আরোপিত হবে। এর উদাহরণ হলো, একটি মহিলা প্রথমেই যেদিন রক্ত দেখে, সেইদিন থেকেই রক্ত আসা বন্ধ হয় না। কিন্তু কিছু পার্থক্য সে দেখেছে, যেমন, দশদিন রক্তের রঙ দেখেছে কালো ছিলো, বাকী দিনগুলোতে লাল ছিলো, অথবা দশদিন রক্ত দেখেছে গাঢ়, বাকী দিনগুলোতে পাতলা ছিলো, অথবা দশদিন রক্তের গন্ধ হায়েযের মত ছিলো, বাকী দিনগুলিতে কোনো গন্ধ ছিলো না, তাই যে দিনগুলোতে রক্তের রঙ কালো ও গাঢ় ছিলো এবং হায়েযের গন্ধ ছিলো, সেই দিনগুলোই হায়েয বলে গণ্য হবে, বাকী ইস্তিহাযা।

তৃতীয়ঃ তার মাসিক হওয়ার না কোনো নির্দিষ্ট সময় থাকে, আর না কোনো সঠিক পার্থক্য নেই। যেমন, প্রথম যখন থেকে সে রক্ত দেখেছে, তখন থেকেই তার ইস্তিহাযার রক্ত অব্যাহত আছে। আর রক্তের রঙও একই রকম অথবা রক্তের স্বরূপ এমন বিভিন্ন ধরনের যে, তা হায়েয হতে পারে না। এমতাবস্থায় সে অধিকাংশ নারীর নিয়মানুযায়ী কাজ করবে। তাই প্রত্যেক মাসে ছয় দিন অথবা সাত দিন মাসিক ধরবে। যখনই সে রক্ত দেখবে, তখন থেকেই গণনা শুরু করবে। (ছয় অথবা সাত দিনের) অতিরিক্ত দিনগুলো ইস্তিহাযা গণ্য হবে।

ইস্তিহাযার বিধানঃ

ইস্তিহাযার বিধান পবিত্রতার বিধানের মতই। ইস্তিহাযাজনিতা ও পবিত্র মহিলাদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো,

১। প্রত্যেক নামাযের সময় তাকে অযূ করতে হবে।

২। যখন সে অযূ করার ইচ্ছা করবে, তখন রক্তের দাগ ধুয়ে নিবে এবং রক্তকে শোষণ করার জন্য লজ্জাস্থানে কোনো সুতির কাপড়ের টুকরা রেখে নিবে।

নিফাসের বিধানঃ

ঠিক প্রসবের সময় অথবা তার দু'দিন বা তিনদিন আগে-পিছে বেদনাজড়িত যে রক্ত রেহেম থেকে বের হয়, তাকেই নিফাসের রক্ত

বলে। আর যখনই এই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তখনই পবিত্র বলে গণ্য হয়। তবে যদি ৪০দিন পার হয়ে যায়, তাহলে (দিনে) সে গোসল করে নিবে, যদিও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে। কারণ, ৪০দিনই হলো নিফাসের সর্বশেষ সময়। তবে ৪০ দিনের পর প্রবহমান রক্ত যদি মাসিকের রক্ত হয়, তাহলে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত মাসিকের নিয়ম পালন করবে। তার পর গোসল করবে। আর নিফাস তখনই প্রমাণিত হবে, যখন সৃষ্টের মধ্যে মানব আকৃতির প্রকাশ পাবে। কিন্তু যদি এমন ছোট অসম্পূর্ণ ভ্রূণ হয়, যাতে মানব আকৃতির প্রকাশ পায় না, তাহলে তার রক্ত নিফাসের রক্ত বলে প্রমাণিত হবে না, বরং তা কোনো রগের রক্ত গণ্য হবে, আর এ অবস্থায় ইস্তিহাযার বিধান তাতে কার্যকরী হবে। মানব আকৃতির প্রকাশ হওয়ার সর্ব নিম্ন সময় হল, গর্ভধারণ আরম্ভ থেকে ৮০দিন। আর সর্বোচ্চ হল ৯০দিন। আর নিফাসের বিধান হল, উল্লিখিত মাসিকের বিধানের মত।

মাসিক প্রতিরোধকঃ

মাসিক প্রতিরোধক কোনো জিনিস নারী ব্যবহার করতে পারবে দুই শর্তের ভিত্তিতে। যেমন,

১। তার ব্যবহারে যেন কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তা জায়েয হবে না।

২। এটা স্বামীর অনুমতিতে হতে হবে, যদি তা স্বামীর সম্পর্কিত কোনো

বিষয় হয়। মাসিক নিয়ে আসে এমন কোনো জিনিসও ব্যবহার করতে পারবে দুই শর্তের ভিত্তিতে। যেমন,

১। স্বামীর অনুমতি।

২। কোনো পালনীয় ওয়াজিব থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাহানায় যেন এ কাজ না করা হয়। যেমন, রোযা রাখা ও নামায পড়া ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করা।

গর্ভধারণ প্রতিরোধক ব্যবহার করা দু'প্রকারের। এক হলো, চিরতরে প্রতিরোধ করা, এটা জায়েয নয়। দুই, সাময়িকের জন্য প্রতিরোধ করা। যেমন, নারী যদি অত্যধিক প্রসবকারিণী হয়, আর প্রসব তাকে দুর্বল করে দেয়, তাহলে দু'বছর অন্তর একবার প্রসব হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভালো। আর এটা জায়েয, তবে স্বামীর অনুমতি থাকতে হবে এবং নারীর যেন কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	ইসলামে নারীর মর্যাদা
৭	নারীর সাধারণ কিছু অধিকার
৭	মালিক হওয়ার অধিকার
৮	বিবাহ করার অধিকার
৮	শিক্ষা গ্রহণের অধিকার
৮	সাদক্বা করার অধিকার
৯	অসীয়ত করার অধিকার
৯	রূপচর্চার অধিকার
১০	পানাহারের অধিকার
১০	স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার
১২	পর্দা
১৯	মাসিক ও নাফাসেন বিধান
১৯	মাসিকের সময় সীমা
১৯	গর্ভবতীর মাসিক
১৯	মাসিকের ব্যতিক্রম
২১	মাসিকের বিধান
২৫	ইস্তিহাযাহ ও তার বিধান
২৭	নিফাসের বিধান
২৭	মাসিক প্রতিরোধক